মৈত্রীশ ঘটক

ফ্যাতাড়ুনমিক্স: গতি-অগতির অর্থনীতি

এক

ফ্যাতাড়ু বা চোক্তারদের সাথে কেতাবি অর্থনীতির কী সম্পর্ক? এটা কী Freakonomics-এর মতো ফ্যাতাড়ুনমিক্স গোছের কিছু হতে পারে? শুনে হালকা চালে বলা মনে হলেও, এই গুরুভার প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে যখন ভাষাবন্ধনের তরফ থেকে তথাগত ভট্টাচার্য এবং অরিন্দম সেনগুপ্ত আমাকে ২০২১ সালের নবারুণ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানান।

এখানে বলে রাখা ভালো নবারুণ ভট্টাচার্য (বা বাপ্পা-দা) আমার আপন পিসতুতো দাদা। তাই সম্পর্কে তথাগত আমার ভাইপো, যদিও বয়েসের হিসেবে আমি আর ও বেশ কাছাকাছি। Nepotism কথাটা এসেছে nepos অর্থাৎ ভাইপো থেকে (যার থেকে ''নেপোয় মারে দই'' কথাটি সম্পূর্ণ অন্য দ্যোতনা পায়)। তাই অর্থনীতিচর্চার শুষ্কং কাষ্ঠং জগৎ থেকে ''ফ্যাৎ ফ্যাৎ সাঁই সাঁই'' করে উড়ে এসে আমার এই বিষয়ে বলতে আসাটা খানিকটা reverse-nepotism বা পিতৃব্যতন্ত্র বলা যেতে পারে।

তবে পারিবারিক সম্পর্কের কথা সরিয়ে রেখেও, বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক হিসেবে নবারুণের লেখার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। নবারুণের রচনাশৈলী (যথা, পুরন্দর ভাটে-র কবিতা) আমাদের মূলধারার সাংস্কৃতিক জগতের ভক্তিগদগদ ভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তিনি এক নতুন ভাষা সৃষ্টি করেছেন যাতে অসাধু শব্দপ্রয়োগ করা হয় বন্দুকের গুলির মতো— সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা (তার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বাম-ও আছে) ও আয়েশি এবং আত্মতুষ্ট বিত্তবান সমাজের হাজারো নষ্টামি, ভণ্ডামি এবং ন্যাকামির প্রতি অমোঘ লক্ষ্যে। কেউই পার পায়না নবারুণের তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ থেকে— পুরন্দর ভাটের কবিতার ছত্রে ছত্রে কাদের প্রতি নিশানা তার তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। তার মধ্যে বুদ্ধিজীবী (''কী নির্জীব, কী নির্জীব, নির্ঘাত ওটি বুদ্ধি জীব।''), সুশীল সমাজ (''সুশীল সমাজ জানে/সকল ধাঁধার মানে'') বা ক্ষমতার কাছে মাথা নোয়ানো আজ্ঞাবহ দাস, এরা সবাই আছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীল যে ধারা তাতে ব্যতিক্রমী বাঁক এনেছেন নবারুণ, শুধু রচনাশৈলী নয়, সারবত্তা এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেও। এই ধারা থেকে পারিবারিক সূত্রে খানিকটা আক্ষরিক অর্থেই নবারুণ উদ্ভূত হয়েছেন— তিনি বিজন ভট্টাচার্য ও মহাশ্বেতা দেবীর একমাত্র সন্তান, মণীশ ঘটকের (যুবনাশ্ব) জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র, এবং ঋত্বিক ঘটক তাঁর সম্পর্কে দাদু। বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীল ধারার ঐতিহ্য অনুসারে নবারুণের গল্প ও উপন্যাসের চরিত্ররা সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ। কিন্তু তফাত হল, তাঁরা সংগ্রামী কৃষক বা শ্রমিক নন। তাঁর লেখায় অন্তিম দৃশ্যে কোনো সংগ্রামী আশাবাদ বা উত্তরণের আশ্বাস— সে শেষ দৃশ্যে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন না হলেও, লাল লণ্ঠন বা ঝান্ডা ওঠার মাধ্যমে তার প্রতিশ্রুতি— এসব কোনো কিছুই নেই। বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’-ও শেষ হচ্ছে ঘরে ফেরার আশাবাদে। কিন্তু নবারুণের লেখায় তার বদলে যা আছে তা হল পুঞ্জীভূত অবরুদ্ধ এক ক্রোধের বিস্ফোরণ, যার আপাতভাবে দুষ্ট জোতদার বা ব্যবসায়ী কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। আর আছে নব্বইয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের স্বপ্নভঙ্গ। এবং, আরও প্রত্যক্ষভাবে আছে ষাট ও সত্তর দশকের নকশালবাদী আন্দোলনের আশাভঙ্গের বিষাদময় নেপথ্য মূর্ছনা। এর উদাহরণ হিসেবে ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে পুলিশ হেফাজতে বিনুর মৃত্যু এবং মৃত্যুর ঠিক আগে আবৃত্তি করা সেই কবিতা— ‘আমি দেখতে পাচ্ছি/আমার চোখের সামনে, আমার এতকালের দেখা/ পুরনো দুনিয়াটা পাল্টে যাচ্ছে’, এবং সেই স্মৃতির পাশাপাশি হারবার্টের মলিন পারিপার্শ্বিক ও অন্তিম পরিণতির কথা মনে করা যেতে পারে। এখানে অবশ্য মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’-তে ব্রতীর কথাও মনে পড়ে যেতে বাধ্য।

কিন্তু নবারুণের লেখায় শুধু দিনবদলের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নয়, এক জাদুবাস্তবের ছোঁয়া তার পরতে পরতে লেগে আছে যা তাকে আগের প্রজন্মের প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা থেকে খানিকটা আলাদা করে চিহ্নিত করে। নবারুণের গল্পে জাদু-বাস্তবের এই কুয়াশা উঠে এসেছে নগরসভ্যতার এক ক্লেদাক্ত জলাভূমি থেকে। তাঁর চরিত্ররা তথাকথিত নাগরিক লুম্পেন সমাজের প্রতিনিধি, যেমন, ফ্যাতাড়ু, চোক্তার, হারবার্ট ও তার বন্ধুরা। কিন্তু তাদের অপরিশীলিত আচরণ ও ভাষা সত্ত্বেও তারা কিন্তু মানবিক। যেমন, হারবার্টের মৃত্যুতে তার পাড়ার বন্ধুদের বেদনার অভিব্যক্তি এবং অন্তিমযাত্রার বর্ণনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। তাঁর লেখায় বারবার আসা এই চরিত্ররা সৎ এবং তাদের নিজস্ব নৈরাজ্যবাদী ধরনে, ঠোঁটকাটা ও প্রতিবাদী। তারা স্থিতাবস্থা মেনে নিচ্ছে না, তাদের মতো করে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করে চলেছে এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের প্রতি একধরণের সহমর্মিতা কাজ করে যায়— যেভাবে ডিএস ও মদনের এবং পরে তাদের সাথে পুরন্দর ভাটের ভাব হয় এবং যেভাবে তারা তাদের নিশানা নির্ধারণ করে তার

মধ্যে থেকে তা ফুটে বেরোয়। তবে নবারুণের প্রতিষ্ঠানবিরোধীতার লক্ষ্য শুধু রাষ্ট্রশক্তি বা বৃহৎ পুঁজি নয়। তাঁর নিশানার মধ্যে আছে সামাজিক, রাজনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক যে-কোনো ক্ষেত্রেই দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্ষমতার নানা প্রাচীর যা বহিরাগতদের প্রবেশের পথে অন্তরায় খাড়া করে রেখেছে। 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক'-এর সূচিপত্র থেকেই তার একটা নমুনা পাওয়া যাবে— বইমেলা, শুভবিবাহ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, কবি-সম্মেলন, ফ্যাশন প্যারেড, থেকে সাধু সমাগম, কোনো কিছুই ছাড় পায় না।

এবারে আসি আজকের মূল বিষয়ে— অর্থাৎ, গতি-অগতির অর্থনীতি। যে প্রশ্ন ধরে আমি এই প্রবন্ধের মূল বিষয়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করব, তা হল নবারুণের লেখায় ফ্যাতাড়ু ও সমগোত্রীয় চরিত্রদের অর্থনৈতিক পরিচয় কী? তারা কোথা থেকে আসছে? জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে সমীক্ষা করলে— যেমন আমাদের নানা সরকারি ও বেসরকারি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষায় করা হয়— তাতে এরা কোন শ্রেণিতে পড়বে? অবশ্য বাদুড়ের মতো উড়ে গেলে তাদের ধরা যাবে না এমনিতেই আমাদের সমীক্ষাগুলোর পরিধির বাইরে কত মানুষ থেকে যান! এদের নানা কাজে ও কথায় যে বিক্ষোভ ও প্রতিষ্ঠানবিরোধীতা প্রকাশ পাচ্ছে সেটা কী ধরনের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে হচ্ছে? মনে রাখতে হবে, তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়' (১৯৮৩) এবং ছোটগল্প সংকলন 'হালাল ঝান্ডা' (১৯৮৭) বাদ দিলে, 'হারবার্ট' (১৯৯৩) থেকে শুরু করে তাঁর বাকি সব গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে নব্বইয়ের দশকে, যখন দেশে উদারীকরণ এবং বিদেশে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সংকট এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পালাবদল হয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে নবারুণের এই চরিত্রদের সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত গল্প সংকলনের ('নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প', প্রতিক্ষণ) ভূমিকায় নবারুণ নিজেই লিখছেন: ''প্রথম চারটি ছাড়া বাকি গল্পগুলো গত এক দশক ধরে লেখা যে দশকে মানুষের এগিয়ে চলার, শোষণমুক্ত ও সমাজব্যবস্থা পাল্টানোর মডেল পুঁজি ও প্রতিক্রিয়ার আঘাতে ও বামপন্থীদের আবশ্যিক আত্মসমীক্ষার অভাবের কারণে অনেকটাই তছনছ হয়ে গেছে। যে শতক সবচেয়ে আশা জাগিয়েছিল সেই শতক শেষ হচ্ছে অবসাদে, বিষাদে, যন্ত্রণাজর্জর অবস্থায়।'' এই সংকলনের শেষ গল্প হল 'ফ্যাতাড়ু' যেটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে 'প্রমা' পত্রিকায় এবং যা পরে ফ্যাতাড়ুদের নিয়ে অন্য গল্পগুলোর সাথে 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য' বলে সংকলনে বেরোয় ২০০৪ সালে।

নবারুণের লেখায় ফ্যাতাড়ুদের মতো বা হারবার্ট ও তার বন্ধুদের মতো যে প্রান্তিক শ্রেণির চরিত্রদের দেখা যায়, তাদের মধ্যে একটাই সাধারণ যোগসূত্র— তারা

তথাকথিত মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, বহিরাগত, কোনো প্রতিষ্ঠিত দল, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের বাইরে। তাদের আর্থিক সামর্থ্য সীমিত এবং কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাদের হাতছানি দিচ্ছে না। একধরনের দুর্গন্ধভরা এক আবর্জনাস্তূপের মতো নাগরিক ক্লেদ তাদের চারপাশ ঘিরে আছে— ফ্যাতাড়ুদের 'অ্যাকশন' পর্বগুলোতে তাদের উড়ন্ত বাদুড়ের মতো সুভদ্র সমাজের নানা অনুষ্ঠানে তা আক্ষরিকভাবে নিক্ষেপ করতে দেখা যায়।

তাঁর লেখার এই পরিচিত উপাদানগুলোর আপাতনৈরাজ্যমূলক দিক ছাড়াও আর যা আছে তা হল নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে যে আর্থিক-উদারীকরণ জমানা শুরু হয়, যা গত তিন দশক ধরে চলছে, তার এক বিধ্বংসী সমালোচনা। আর্থিক-উদারীকরণ পরবর্তী জমানায় উন্নয়ন ও অগ্রগতির যে মডেল গড়ে উঠেছে, তা যেন প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত বা ফটকবদ্ধ আবাসনের মতো— সেখানে সবার ঢোকার অধিকার নেই। ঠিক ফটকবদ্ধ আবাসনে বা শপিং মলে যাদের গাড়ি আছে তাদের অনায়াসে প্রবেশের অধিকার আছে, অন্যদের ক্ষেত্রে প্রবেশের পথে অনেক অন্তরায়, তারই মতো উন্নয়নের এই প্রাঙ্গণে প্রবেশের অধিকার আছে শুধুই অতি অল্পসংখ্যক কিছু এলিটদের। এদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার সাথে দেশের বাকি ৯০ শতাংশ মানুষের অবস্থার আকাশপাতাল ফারাক। তাদের বিত্ত ও সামাজিক অবস্থান তাদের বাকি সমাজের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে তৃতীয়-বিশ্বে প্রথম-বিশ্বের জীবনযাত্রা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে সক্ষম করে। উন্নয়নের এই সুসজ্জিত ও সুশোভন প্রাঙ্গণ থেকে যাদের সরিয়ে রাখা হচ্ছে, নবারুণের লেখায় তাদের জীবনের অন্ধকার, ক্লেদ এবং অবস্থাবদলের সম্ভাবনা নিয়ে সার্বিক নৈরাশ্য যেন তারা ফিরিয়ে দিচ্ছে সোচ্চার প্রতিবাদে। অসাম্য নিয়ে একটিও গম্ভীর কথা ব্যবহার না করে তাঁর লেখার এই দিক আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় সমাজের ৯০ শতাংশ মানুষের জীবনের বাস্তব অবস্থার কথা।

নবারুণের প্রান্তিক চরিত্ররা শুধু চেতনার দিক থেকেই মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তারা আক্ষরিক অর্থেই অর্থনীতিতে যাকে সংগঠিত ক্ষেত্র বলা হয় (organised sector) তার বাইরে। এদের অধিকাংশই নানা রকম ছোটখাটো ব্যবসা বা শ্রমনির্ভর কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে, কিন্তু তারা বাঁধা চাকরির নিরাপত্তাজালের বাইরে, আবার কৃষিজীবী বা সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির অঙ্গও নয়। মার্কবাদী বা মূলধারার অর্থনীতিতে যে বিভিন্ন ধরনের পেশাভিত্তিক অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস আছে, সেই মূল শ্রেণিগুলোর (শ্রমিক, কৃষক, পুঁজিপতি, জমিদার ইত্যাদি), তার বাইরে তারা। এই শ্রেণিবিন্যাসে তারা যেন এক অবশিষ্টাংশ বা যাকে রেসিডুয়াল ক্যাটেগরি বলা হয়— সমীক্ষায় যাকে অসংগঠিত ক্ষেত্র বলে ধরা হয়— অথচ সংখ্যার দিক থেকে তারাই সংখ্যাগুরু।

গতি ও প্রগতির যে আখ্যান আমরা মূলধারার অর্থনীতির চর্চায় পাই, তাতে আমরা যে কথাগুলো বারবার শুনি তা হল আর্থিক বৃদ্ধি (এখন অবশ্য কোভিড-পরবর্তী জমানায় আর্থিক সংকোচনের পর্ব চলছে— এই প্রসঙ্গে পরে আসছি) ও দারিদ্র্য দূরীকরণ— এই পথেই উন্নয়নের প্রসাদ কোনো-না-কোনো সবার কাছেই পৌঁছবে। কিন্তু আর্থিক বৃদ্ধি ও দারিদ্র দূরীকরণের এই আখ্যানে যে আশার আলো আছে, তাতে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের জীবনের অগতি, অচলাবস্থা, এবং দুর্গতির ছবিটা কিন্তু যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে না। মূলধারার অর্থনীতির আলোচনায় (তার মধ্যে শুধুই অন্ধ-উদারীকরণের সমর্থক গোষ্ঠী শুধু নয়, প্রগতিশীল ঘরানাকেও ধরছি) গড় জাতীয় আয় বা দারিদ্ররেখার তলায় থাকা মানুষের শতাংশের আলোচনা থেকে দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মানের যে ছবিটা পাওয়া যায় তা খুবই সীমিত। আর জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার থেকে সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তনের বা উন্নয়নের সম্ভাবনার যে ছবিটা পাওয়া যায় সেটাও খুব অপরিষ্কার। যুক্তিটা খুব সোজা— যে দেশে সবাই মাসে দশ হাজার টাকা পান, আর যে দেশে ধনীতম ১০ শতাংশ মাসে একানব্বই হাজার টাকা পান আর ৯০ শতাংশ এক হাজার টাকা পান, দু'দেশের গড় আয় এক কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মানে এবং অসাম্যের মাত্রায় আকাশপাতাল তফাত। আর দারিদ্ররেখা যদি খুব কম করে ধরা হয় (এ প্রসঙ্গে পরের অংশে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে), তাহলে আর্থিক বৃদ্ধির সাথে সাথে হতদরিদ্র শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা খানিক কমলেও, তার সাথে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির সম্পর্ক খুব একটা নাও থাকতে পারে। হিসেবটা সোজা— পাশ করার নম্বর যত কম করে ধরা হবে (ধরুন, ৩০ শতাংশ-এর বদলে ২০ শতাংশ) তাহলে পাশের হার বেড়ে গেলেও পরীক্ষার গড় ফলাফলে সামান্যই উন্নতি হতে পারে।

আসল কথা হল, গড় জাতীয় আয়, তাঁর বৃদ্ধির হার, দারিদ্ররেখার তলায় থাকা মানুষের অনুপাত এগুলো থেকে সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার একটা সামগ্রিক ছবি পাওয়া গেলেও, যে দেশে অসাম্য শুরু থেকেই বেশি সেখানে অধিকাংশ মানুষের জীবনের মানের যে ছবিটা পাওয়া যায়, সেটা খুবই অসম্পূর্ণ এবং অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। এই যেমন কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে জাতীয় আয় কমেছে (৭.৩ শতাংশ) কিন্তু তা সত্ত্বেও শেয়ার বাজার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতে পেরেছে এবং তার মূল সূচক গত বছরের তুলনায় ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধির দিকে এগিয়েছে। তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই এটা জেনে যে ভারতে বিলিয়নপতি ধনকুবেরের সংখ্যা এই এক বছরে ১০২ থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪০। একই সাথে কোভিড-১৯ এর ধাক্কায় ভারতে দরিদ্রশ্রেণির মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ হল সাড়ে সাত কোটি। অর্থাৎ,

ধনীদের আয় ও বিত্ত বেড়েছে অনেকটা, এদিকে দরিদ্রশ্রেণির আয় কমেছে অনেকটা, কিন্তু সার্বিকভাবে দেখলে গড় আয় কমেছে ''মাত্র'' ৭.৩ শতাংশ! একটি সমীক্ষা (সিএমআইই) থেকে জানা যাচ্ছে কোভিডের যে দ্বিতীয় ঢেউ, যা এ বছরের মার্চ থেকে জুলাই অবধি চলল, তাতে এক কোটি মানুষের চাকরি গেছে, এবং সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলির ৯৭ শতাংশেরই পারিবারিক আয় কমেছে। ধনীদের আয় যেহেতু মোট আয়ের অনেকটা, তাই সেটা অনেকটা বাড়লে বাকি ৯৭ শতাংশের আয় কমলেও গড় আয়ের সংকোচন অতটা বেশি মনে হয় না। প্রগতির সাবেকি আখ্যানে জাতীয় আয় বাড়া বা কমার সাথে যে কারো অগ্রগতি, কারো অগতি এবং কারো যে অধো-গতি— এই ব্যাপারটা ধরা পড়ে না। জাতীয় আয় ও তার বৃদ্ধির হার, দারিদ্ররেখার তলায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত ইত্যাদি উন্নয়নের এই যে সার্বিক (aggregate) বা গড় সূচকগুলো, তাদের এই সমস্যাগুলোর কারণে আমি যে ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, তা হল মোবিলিটি বা চলমানতা, যাকে আমি আরেকটু কথ্য ভাষায় 'গতি-অগতির অর্থনীতি' বলছি।

চলমানতার অনেকগুলি দিক আছে। যেমন, কেউ শ্রমজীবী হিসেবে শুরু করে কিছু সঞ্চয় করে একটা ছোট ব্যবসা খুললেন, এবং তাঁর সন্তানেরা পড়াশুনো করে একদিন ভালো চাকরি পেলেন বা আরও বড় ব্যবসায়ী হলেন— এর মধ্যে একটি প্রজন্মের জীবৎকালে চলমানতা এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলমানতা, এই দুটোই উপস্থিত। আবার কেউ ধরুন সারাজীবনই একই জায়গায় থেকে গেলেন, এবং তাঁর সন্তানদের পেশা ও আয়ের কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন হল না। দুই দেশের গড় আয় বা গড় আয়ের বৃদ্ধির হার এক হলেও, এই চলমানতার দিক থেকে অনেক তফাত থাকতে পারে, এবং তার থেকে সাধারণ মানুষের জীবন, তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা বা নিরাশার আকাশপাতাল তফাত হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্য ধারণাগুলির সাথে চলমানতার তাই একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে সচরাচর জাতীয় আয়ের মানের স্তর বা তার বৃদ্ধির হার, অথবা কত সংখ্যক মানুষ দারিদ্ররেখার তলায় আছেন, বা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অসাম্য কিংবা মানবসম্পদ বিকাশের সূচক ব্যবহার করা হয়। এই সূচকগুলো হয় স্থিতিশীল নয়তো পরিবর্তন ধরা পড়ছে যান্ত্রিকভাবে (যেমন, বৃদ্ধির হার)। ঠিক যেমন কোনো মানুষের ওজন বা তার বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তনের সূচক হিসেবে সন্তোষজনক নয়— আমরা তাঁর হার্ট বা কিডনির সক্ষমতা বা রক্তচাপ পরীক্ষা করব, সেরকম উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় যে গুণগত পরিবর্তনের দিক আছে, তা ঠিকভাবে এই স্থিতিশীল সামগ্রিক সূচকগুলি বা তাদের যান্ত্রিক বৃদ্ধির হার (যেমন, গড়পড়তা আয়ের মান বা তার বৃদ্ধির

হার) দ্বারা ধরা পড়ে না, তাঁর জন্যে আরও সূক্ষ্ম, আরও গতিশীল সূচকের প্রয়োজন। আমরা জানতে চাইব বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের গড় আয় বা জীবনযাত্রার মান কি, সেগুলো বাড়ছে না কমছে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পেশাগত, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না একই জায়গায় আটকে আছে।

অর্থনৈতিক চলমানতা উন্নয়নের এমনই এক মাপকাঠি যা দিয়ে বোঝা যায় অর্থব্যবস্থাটি স্থবির না সচল। দারিদ্র বা অসাম্য থাকলেও, অর্থনীতিতে যদি যথেষ্ট গতিময়তা বা বেগবত্তা (dynamism) থাকে, তাহলে অবস্থার পরিবর্তনের আশা থাকে। যে সর্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী অন্ধকার নবারুণের প্রান্তিক চরিত্রগুলির ধমনীতে সদাবহমান, যা কৃষ্ণপরিহাসের রূপে তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে বেরিয়ে আসে তা শুধু দারিদ্র বা অসাম্য নিয়ে নয়, তার পেছনে আছে দমবন্ধ এক অচলতার ভার। এর পেছনে আশি আর নব্বইয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির টালমাটাল অবস্থাও কাজ করেছে (যা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও প্রভাবিত করে কারণ 'সোভিয়েত দেশ' বলে যে পত্রিকাতে চাকরি করতেন তিনি, সেটি উঠে যায় নব্বইয়ের দশকের গোড়ায়)। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' শেষ হয়েছে যে আশার সুরে, বা মহাশ্বেতা দেবীর অনেক লেখায় যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রত্যয়ী উচ্চারণ, নবারুণের লেখনীর শাণিত বিদ্রুপে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা পাই না।

এবারে এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আসব, যেখানে ফ্যাতাড়ুদের চোখ দিয়ে দেখলে দেশের অর্থনীতির চালচিত্রটা কেমন দেখাবে তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণনা করব।

দুই

ভারতবর্ষের মোট শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশেরও বেশি অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন। এই ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে ছোট ছোট ব্যবসা, পরিষেবা ও দোকানপাট দিয়ে। বাজার যাবার পথে রাস্তার দু'পাশে আপনি এঁদের ও এঁদের জীবিকা অর্জনের প্রয়াস দেখতে পাবেন। এই ক্ষেত্রটির বৃদ্ধির বা সমৃদ্ধির পথ খুবই সীমিত। এদিকে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ আসে এখান থেকেই। ভাবুন— তার মানে সংগঠিত ক্ষেত্রে দেশের মোট শ্রমশক্তির ১৫ শতাংশের কম কাজ করলেও, মোট জাতীয় আয়ের বাকি ৫০ শতাংশ আসে সেখান থেকে— উৎপাদনশীলতার এবং সমৃদ্ধির তফাত এখন থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সংগঠিত ক্ষেত্রের ফটক পেরিয়ে ঢুকতে গেলে যে আর্থিক ও শিক্ষাগত প্রবেশপত্র লাগে তা নেই বলেই বাকিরা অসংগঠিত ক্ষেত্রের স্বল্প আয়, জীবিকার্জনের অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা সীমিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আবদ্ধ হয়ে আছেন।

গড় আয়ের যদি তুলনা করি, তাহলে ২০১৮-১৯ সালে সরকারি একটি সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে যে সারা ভারতে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবীদের গড় আয় মাসিক ৯৫০০ টাকা, কিন্তু সংগঠিত ক্ষেত্রে তা হল ২৬০০০ টাকা, যা প্রায় এর তিনগুণ। শপিং মল আর ফটকবদ্ধ আবাসনের ঝকঝকে ভারত আর ফ্যাতাড়ুদের জগতের মধ্যে তফাত— যা না উড়ে পার হওয়া যায় না— নেহাতই সাহিত্যিক কল্পনা নয়।

তবে মনে রাখতে হবে এগুলো গড় সংখ্যা। যেখানে বৈষম্যের মান খুব বেশি, সেখানে গড় থেকে যা জানা যায়, তার তুলনায় বাস্তবে অসাম্য ও দারিদ্রের চিত্রটা আরো অনেক বেশি আশঙ্কাজনক। আমরা যদি সরাসরি দারিদ্ররেখার দিকে দেখি, গ্রামীণ ও নগরাঞ্চলে প্রতি মাসে জনপিছু ১৫০০ টাকা এবং ২১০০ টাকা হল বর্তমান দারিদ্ররেখা। ২০১৭-১৮ সালে জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ এর তলায় ছিল। উদারীকরণের পর তিন দশকের উচ্চহারে বৃদ্ধি স্বত্ত্বেও দারিদ্রসীমার হিসাবে যে আয়ের স্তরকে ধরে করা হয়েছে তার মানকে যদি মাত্র ২০ শতাংশ বাড়ানো হয়, তাহলে দেখা যাবে জনগণের প্রায় ৫০ শতাংশ এই দারিদ্রসীমার চৌকাঠ পেরোতে পারেনি।

তার মানে এই নয় যে বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র কমেনি। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারতে দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিলেন ৪৫ শতাংশ মানুষ। এই সংখ্যা এখন তার অর্ধেক হয়ে গেছে। আসল কথা হল গরিবদের তুলনায় ধনীদের আয় অনেক বেশি দ্রুতহারে বেড়েছে। ১৯৯৮ এবং ২০১৯-এর জনপ্রতি জাতীয় আয়ের তুলনা করলে দেখা যাবে ৮.৫ গুণ বেড়েছে। অথচ গ্রামীণ মজুরির ক্ষেত্রে তা বেড়েছে মাত্র ৫.৪ গুণ। তার অর্থ হল, গড় আয় যদি দরিদ্রদের আয়ের থেকে অনেকটা বাড়ে তাহলে বৃদ্ধির প্রসাদ গেছে মূলত বিত্তবান শ্রেণিদেরই হাতে।

এই আপেক্ষিক গতি-অগতির অর্থনীতির একটি প্রত্যক্ষ ফলাফল হল উত্তরোত্তর বৈষম্যের বৃদ্ধি। সর্বোচ্চ ১ শতাংশ ধনী শ্রেণির মোট আয়ের মধ্যে ভাগ ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ ১৯৬১ সালে, এবং ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে ১৯৮১ সালে তা দাঁড়ায় ৬.৯ শতাংশ। তারপর, ১৯৯০ এর দশকে তা আবার উপরে উঠতে শুরু করে। ১৯৯১ সালে ১০.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে তা হয় ২১.৭ শতাংশ আর নীচের দিকের ৫০ শতাংশের মোট আয়ের ভাগ ১৯৬১ থেকে ১৯৮১-র মধ্যে মোটামুটি ২১ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের মধ্যেই কিছুটা স্থিতিশীলভাবে ঘোরাফেরা করত, কিন্তু তারপর থেকে এটি হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৯৯১ সালে ২২.২ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ১৪.৭ শতাংশে নেমে আসে।

গতি-অগতির অর্থনীতি যে দরিদ্রদের পক্ষে কতটা প্রতিকূল তা দেখা যাবে যদি

আমরা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের আর্থিক চলমানতার হার দেখি। মানব উন্নয়ন সমীক্ষার তথ্য ব্যবহার করে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে ভারতের ক্ষেত্রে এই চলমানতার হার খুবই কম। দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর গড় আয় এবং শিক্ষাগত ফলাফলের কিছু উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ভারতে উর্ধ্বমুখী চলমানতা বছরের-পর-বছর কমই থেকে গেছে। যেমন, নিম্ন আয়ের যে পেশাগুলি সেখানে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পেশা, আয় বা শিক্ষাগত উন্নতির হার খুবই সীমিত— কৃষিশ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের ৫০ শতাংশ ঐ একই পেশায় থেকে যান। যারা জন্মে ইস্তক গরিব, তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গরিবই থেকে যাচ্ছেন, ফলস্বরূপ অসাম্যও অব্যাহত থাকছে। এই একই সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে এও জানা যাচ্ছে যে, উদারীকরণের পরে গড় আয় বেড়েছে কিন্তু আয় বা শিক্ষার বিন্যাস যদি দেখি, সেখানে চলমানতার হারের বৃদ্ধির প্রমাণ খুব একটা নেই— আগের প্রজন্মের যে আপেক্ষিক অবস্থান তা পরের প্রজন্মে প্রায় একই রকম দেখা যাচ্ছে। তার মানে চলমানতার কোনো প্রমাণ বা উদাহরণ নেই তা নয়, কিন্তু এই হারের পরিবর্তন সারা দেশের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে দেখলে পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য নয়।

আসলে সমস্যা তাই শুধুমাত্র দারিদ্র বা অসাম্য নয়, সেগুলো আরও গভীরতর সমস্যার উপসর্গমাত্র। দ্রুত বৃদ্ধির সাথে যদি অর্থনৈতিক সুযোগ সমস্ত শ্রেণির মধ্যে প্রসারিত হয়, তাতে সাময়িক ভাবে অসাম্য বাড়লেও পরে তা কমতে বাধ্য। আসল সমস্যা হল, সমাজের বড় একটা অংশের ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও হতাশা। তাই যে বদ্ধ জলাভূমি থেকে ফ্যাতাড়ুরা ডানা মেলে ওড়ে সুশীল সমাজকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও অস্বস্তিতে ফেলার বা ভয় দেখানোর জন্যে, সেখানে আসল সমস্যা ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ আশাহীনতার।

তিন

নবারুণ চলে গেলেন ২০১৪ সালে, সেই বছর মোদী-জমানার শুরু। আর ২০২০ সালে করোনাভাইরাস অতিমারী। উড়ন্ত ফ্যাতাড়ুদের বাদুড় মনে করত অনেকে। আর করোনাভাইরাস অতিমারীর মূলেও আছে বাদুড়— এ এক অদ্ভুত সমাপতন যাতে নবারুণ-সুলভ কৃষ্ণপরিহাসের ছোঁয়া আছে। এই অলীক এবং অসহনীয় সময়ে যাঁর উপস্থিতি বড় বেশি দরকার ছিল, সেই নবারুণ নেই, পুরন্দর ভাট নেই, নেই ‘‘কাঙাল মালসাট’’-এর বিজ্ঞ দাঁড়কাক।

আমার লেখা শেষ করব করোনা-পরবর্তী অধ্যায়— যা এখনো চলছে— তা নিয়ে কিছু মন্তব্য করে। কোভিড-১৯ সংকট থেকে আমরা কী শিখলাম?

কোভিড-১৯ প্রথমত এবং প্রধানত একটা জনস্বাস্থ্যের সঙ্কট। তবে এর সঙ্গে সঙ্গেই আসে এক অর্থনৈতিক সঙ্কটও, যা কোনো অংশে কম ধ্বংসাত্মক নয়। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে যেখানে জনগণের ৯০ শতাংশ বিত্তবান নন এবং সুরক্ষিত কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা নেই, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং জনস্বাস্থ্যের সঙ্কট— দুই-ই নিবিড়ভাবে পরস্পর-সংলগ্ন। একটু পিছিয়ে গিয়ে যদি দেখা যায়, এই সঙ্কট মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় দুটি হাতিয়ার হতে পারত জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বেশি করে বিনিয়োগ এবং একটা শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা জাল তৈরি রাখা। যুক্তরাজ্য তথা পশ্চিম ইউরোপে কল্যাণকামী রাষ্ট্র এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর। আশা করা যায়, কোভিড-১৯ পরবর্তী ভারতে বা পৃথিবীর অন্য দেশগুলিতেও জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা জাল তৈরির পেছনে বিনিয়োগ যে আদৌ অপচয় নয়, বরং জাতীয় সুরক্ষা বা অন্যান্য নীতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ—এই রকম একটা বোধোদয় ঘটবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি যা তাতে সেই আশা কতটা বাস্তবসম্মত তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

এই ব্যাধির সূচনা কীভাবে হয়েছে তা এখনও খুব স্পষ্ট নয়। তবে যা জানা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে অন্তত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকায় মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য, তা স্পষ্টতই যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় বা দূষণই যে শুধু সম্ভাব্য সমস্যা নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানবসমাজের ভারসাম্য বিপন্ন হলে মানবসমাজের অস্তিত্বই যে সঙ্কটে পড়তে পারে, এই বিপর্যয় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল। যাঁরা পরিবেশ-সচেতনতাকে ভাবুকদের বিলাস ভাবেন, আশা করি কথাটা তাঁরাও উপলব্ধি করবেন।

এই সবকিছুর ফলে ভারতবর্ষে অর্থনীতির স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য এ দুয়ের সামনে যে কত বড় সঙ্কট তৈরি হয়েছে, তা বুঝতে খুব বোদ্ধা হওয়ার দরকার পড়ে না। স্পষ্টতই আমাদের একটা সুরক্ষা জাল দরকার, বিশেষত তাঁদের জন্য, যাঁরা ফরমায়েশি বা খেপ অর্থনীতির (gig economy) মধ্যে কাজ করেন। বৃদ্ধি আর উন্নয়নের বাঁধা বুলি ছেড়ে এই সুরক্ষা জালের দিকে আমাদের অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার।

এই সঙ্কট থেকে আমরা এও শিখলাম, যে এ পরম দুর্যোগক্ষণে রাষ্ট্রশক্তির বজ্রমুষ্টি বা বাজারি অর্থনীতির অদৃশ্য হাতের ওপর যখন ভরসা রাখা যায় না, সব কিছু যখন বিপন্ন, তখন আমাদের হাতে যা বাকি থেকে যায়, তা হল সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিরাপত্তাজাল। তার মধ্যে আছে পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী, ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

বর্তমান সঙ্কট আবার বুঝিয়ে দিল যে আপনি চান না-চান, অন্য মানুষের সমস্যা আপনারও সমস্যা। আগেও উল্লেখ করেছি যে নবারুণের লেখায় প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের— সে হারবার্টের বন্ধুরাই হোক বা ফ্যাতাড়ুরাই হোক— বিপদে-আপদে পরস্পরের সহমর্মিতা ও দায়বদ্ধতার অনেক উদাহরণ আছে। এই উপলব্ধি মানবপ্রেম থেকে না আসুক, নিজের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদ থেকে আসতে বাধ্য। মানুষের আবশ্যক পণ্য ও পরিষেবা মানুষই পরস্পরকে জোগায়। আবার আর এক জনের ছোঁয়াচে অসুখ হলে, আমাদের অসুখ হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে।

একটু প্রসারিত অর্থে ভাবলে, এই সঙ্কট আমাদের এ কথা ভাবতে আহ্বান জানাচ্ছে যে অর্থব্যবস্থা বিষয়টা আসলে ঠিক কী, এবং আমরা তার থেকে ঠিক কী প্রত্যাশা করি। অর্থব্যবস্থা কি একটা যন্ত্র যা কেবল পণ্যভোক্তাদের ক্ষুধা মেটাবে, আর মুনাফার অঙ্ক বাড়ানোর কাজ করবে, নাকি তা এমন এক বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) যেখানে আমরা সকলে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটা জটিল অন্তর্জালে পরস্পর সংলগ্নতায় বেঁচে আছি? যদি দ্বিতীয়টাই সত্যি হয়, তাহলে কি মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণই কি আমাদের বাঁচার পথ না? মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের তোয়াক্কা না করে অবিরাম প্রগতির অতি-আকাঙ্ক্ষা একটা স্পষ্ট বিপর্যয়কে ডেকে আনে— অনেকটা ফলের লোভে শিকড়শুদ্ধ গাছ উপরে নেওয়ার মতো। মানবিক সম্পদ মানে কিন্তু শুধু ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না, তার মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোটি কোটি শ্রমিকও আছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথে লকডাউনের পরে যে অমানবিক আচরণ হয়েছিল তা যেন আর কখনো না হয়। এই সংকটের সবচেয়ে বড় শিক্ষা তাই 'মানুষের আগে মুনাফা'— এইরকম ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সতর্কীকরণও আসে: মানুষ না থাকলে মুনাফাও থাকবে না। 'কাঙাল মালসাট' উপন্যাসের এই কবিতাটির কথা মনে আছে?

আকাশ-আলো-জল-বায়ু— চার
— এ সকলে যদি থাকে অধিকার
সব মানুষের, ভূমিতে কেবল
দু-চারজনের রহিবে দখল?

এর শেষ লাইনগুলো একটু পাল্টে লেখা যায়:

আকাশ-আলো-জল-বায়ু— চার
— এ সকলে যদি থাকে অধিকার
সব মানুষের, ধনেপ্রাণে কেবল
দু-চারজনের রহিবে দখল?

তা না হলে, ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের বিস্ফোরক শ্মশানকাণ্ডের পরের সেই অমোঘ কথাগুলো মনে পড়ে যেতে বাধ্য। কখন, কোথায়, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে— কেউ বলতে পারেনা।

[এই বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণের জন্যে ভাষাবন্ধন গোষ্ঠী এবং তথাগত ভট্টাচার্য ও অরিন্দম সেনগুপ্ত-কে ধন্যবাদ। লেখাটি লেখার নানা পর্যায়ে মনীষিতা দাশ, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, দেবশ্রী মুখোপাধ্যায়, এবং সর্বাণী চক্রবর্তীর সাহায্য ও মতামত কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি।]